যুগান্তর
শনিবার ১৩ জুন ২০০৯

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ হলেই শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য দূর হবে’

তপন কান্তি সরকার আমাদের আইটি সেক্টরের একজন পথিকৃৎ। ২৭ বছর ধরে তিনি কাজ করছেন তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে। '৮৯ থেকে দীর্ঘ ১১ বছর বেক্সিমকো গ্রুপের এমআইএস সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর আইএফআইসি ব্যাংকের অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম গড়ে তোলেন তিনিই। ২০০৭ সাল থেকে আছেন এনসিসি ব্যাংকে। তিনি এখানকার তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রধান এবং এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট। ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্ন বর্তমান সরকার আমাদের তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরেছেন, সে স্বপ্নের পথ ধরে হাঁটেন তিনি নিজেও। সরকারের এই ভিশন, টার্গেট পূরণের কৌশল এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশনের নানা দিক নিয়ে তিনি কথা বলেছেন যুগান্তর ক্যাম্পাসের সঙ্গে-

● ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করা জরুরি। শিক্ষার্থীদের হাতে ল্যাপটপ তুলে দিলেই কি ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়ে গেল...

●● আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশের পুরো পর্যায়টা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি বলেই মনে হয়েছে, শিক্ষার্থীদের হাতে তথ্যপ্রযুক্তির সব সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়া দরকার। প্রতিটি ব্যক্তি, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ভিশন নিয়ে এগুবে এটাই স্বাভাবিক। তাই ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ডিজিটাইজেশনের টার্গেট ঠিক করা দরকার ছিল। মেনে নিলাম, এদেশে বিদ্যুতের সমস্যা প্রচুর। এজন্য কি আমরা বসে থাকব? বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো বিদ্যুতের এই ওঠানামার মধ্যেই ২৪ ঘণ্টা এটিএম সার্ভিস দিচ্ছে, অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালাচ্ছে কীভাবে? হ্যাঁ, বিদ্যুতের সমস্যার মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিই মানুষের হাতে আলো পৌঁছে দিতে পারে। একটা গ্রামে যদি একটা ই-সেন্টার থাকে, তবে সেখানে সব বয়সী শিক্ষার্থীরা নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য যেতে পারে। এখানে ল্যাপটপের প্রশ্ন আসবে। আসলে ল্যাপটপ এমন এক ধরনের কম্পিউটার, যার কয়েক ঘণ্টা ব্যাকআপ থাকে। ল্যাপটপের দামও তো এখন নাগালের মধ্যে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা অন্তত কয়েকজন মিলে একটি ল্যাপটপ কিনে নিরবচ্ছিন্ন নেট সংযোগ পেতে পারে। এভাবেই গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার ডিজিটাল ডিভাইড ও নলেজ ডিভাইড দূর হয়ে যাবে।

● কীভাবে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে পর্যাপ্ত আইটি সুবিধা পৌঁছে দেয়া যায় তা নিয়ে সরকারের কোনও পরিকল্পনা তো চোখে পড়ছে না...

●● এজন্য ই-এডুকেশন দরকার। যদি পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ই-এডুকেশন চালুর উদ্যোগ নেয়া হলে সব ধরনের বৈষম্য দূর হয়ে যাবে। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসছে না দূরত্বের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি পরীক্ষা পদ্ধতিটি ডিজিটাইজ করেন, তাহলে কয়েক গুণ বেশি শিক্ষার্থী অনলাইনে পরীক্ষা দেবে। ই-এডুকেশনের আরেকটা সুবিধা হল, এটা শিক্ষার্থীর শ্রম ও সময়ের অপচয় কমাবে। যেমন, কোনও শিক্ষার্থী যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ক্লাস মিস করে, তাহলে অনলাইনে সেটা দেখে নেবে। এখন বই-খাতাসহ শিক্ষাসহায়ক নানা উপকরণের অভাবের কথা আমরা বলছি। কিন্তু ইন্টারনেট যেহেতু জ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডার, তাই এ জগতে সহজে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে যে মেয়েটি বা ছেলেটি, তাকে কেউ পিছিয়ে দিতে পারবে না। ই-এডুকেশনের সঙ্গে ডিসট্যান্ট লার্নিং বা দূরশিক্ষণের বিষয়টি যোগ করা যেতে পারে। দূরশিক্ষণের সুবিধা শিক্ষার আরও বিস্তার ঘটবে। সেক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ নির্মাণের যে অবকাঠামো খরচ তা সাশ্রয় হবে।

● টার্গেট ঠিক করা হয়েছে ২০২১ সাল। এর মধ্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সবগুলো গলদ ঠিক করে এর আধুনিকায়ন কি সম্ভব? তাছাড়া যে শিক্ষার্থী আধুনিক প্রযুক্তি সহজে পাচ্ছে, সে যে কাজ পাচ্ছে না, তার কী হবে...

●● সরকারের এখন উচিত ৫ থেকে ১০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এজন্য অবশ্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা

করে নিতে হবে। তারপর কাজ। সারাদেশে প্রচুর আইটি অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে ই-সেন্টার গড়ে তুললে সেখান থেকেই শিক্ষার্থীরা সব সুবিধা পাবে। তাছাড়া বাংলায় প্রচুর কনটেন্ট দরকার। এজন্য সকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে-কলেজে ইংরেজি ও আইটি শিক্ষা সব শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে। স্কুলে স্কুলে কম্পিউটার পৌঁছে দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ডিজিটাল বাংলাদেশ কোন দলের এজন্ডা নয়, এটা রাষ্ট্রের পলিসি হওয়া উচিত। আমি বলব, এসব বিষয়ে লেখালেখি, বলাবলি করার ব্যাপারে মিডিয়াকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। তাহলেই ২০২১ নয়, তার আগেই আমরা স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ পেয়ে যাব।

সাক্ষাৎকার : ফারহানা মিলি

ম বিশ্ববিদ্যালয়

বিরোধগুলোকে প্রকট করে তুলেছে'— এ বিষয়ের পক্ষে দারুণ সব যুক্তি দিয়ে তারা